গীতিকাব্য (Lyric Poetry)

ইংরাজীতে Lyric বা বাংলায় গীতিকাব্য যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত আলংকারিকদের দৃষ্টিতে সে অর্থে গীতিকাব্য বলে সংস্কৃতে পৃথক কোন কাব্যবিভাগ নেই। ইংরাজীতে 'Lyric' কথাটি এসেছে Lyre শব্দ থেকে যার অর্থ বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। Lyre বা বীণার মত তারযন্ত্র সহযোগে যে গান গাওয়া হত তাতে ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতিবেদ্য আনন্দ বা বেদনার আবেগ থাকত। পরে অর্থপ্রসারের ফলে কবির মন্ময় ভাবনার উচ্ছ্বাসে রচিত কবিতা গান না হয়েও গীতিকবিতা আখ্যা লাভ করে। যে কাব্যের দ্বারা গীতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাই গীতিকাব্য। হৃদয়ভাবের ঐকান্তিকতায়, কল্পনার কমনীয়তায়, ছন্দের দোলায় অগেয় গানও গীতিময় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে"। সুতরাং কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ—তা প্রেমের, বিরহের বা ভক্তির যাই হোক না কেন যখন গীতিময় কাব্যরূপ লাভ করে তখনই তা গীতিকাব্যের পদবী লাভ করে। V. Varadachari তাই গীতিকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"A Lyric can therefore be an expression of a feeling, thought or sentiment whether it be of love, grief or devotion."[১] কবির স্বতঃস্ফুর্ত সেই হৃদয়াবেগ এমন ভাবের মূর্চ্ছনা জাগায় যা মানুষের অনুভূতির তন্ত্রীতেও প্রতিধ্বনি তোলে। এই গীতিময়তার আবেদন কাব্যের আবেদন অপেক্ষাও অধিক—"Its expression is spontaneous and it has an emotional appeal, more emotional than a poem.[২]" শুধু তাই নয়, গীতিকাব্য বা কবিতা পাঠ করার পরেও তার ভাবব্যঞ্জনা সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে অনুরণিত হয়। প্রখ্যাত ইংরাজ কবি Keats তাঁর 'Ode on a Greecian Urn" কবিতায় প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন—

"Heard melodies are sweet
But those unheard are sweeter."

সংস্কৃতে খণ্ডকাব্য বলে যে কাব্যবিভাগ আছে তার মধ্যে গীতিধর্মিতা বিদ্যমান। সেই অর্থে সংস্কৃত খণ্ডকাব্যই গীতিকাব্য পদবাচ্য, যদিও সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের ভাব ও বিষয়ের পরিধি আরও ব্যাপক।

সংস্কৃত গীতিকাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস স্পষ্ট না হলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান দুর্লভ নয়। ঋগ্বেদের উষাসূক্তে[৩] গীতি কবিতার নিদর্শন স্পষ্ট। তমসার তীরে নিষ্ঠুর ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চের বিরহে ক্রৌঞ্চবধূর ক্রন্দনে ঋষি বাল্মীকির হৃদয়ের উদ্বেলিত যে শোক শ্লোকরূপ পরিগ্রহ করেছিল তা করুণ গীতিময়তার আবেশে পূর্ণ। সেই ঋষি-কবির আদিকাব্য রামায়ণের রামসীতার বেদনার আবেগ গীতিকাব্য গুণান্বিত।

---

১. V. Varadachari, HSL P–92

২. V. Varadachari : HSL, P–92

৩. ঋগ্বেদসংহিতা, ১/৪৮, ১/৪৯, ৫/৭৯, ৫/৮০ ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' ও 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা'-র ভাবরূপের আবেদনেও গীতিকবিতার নিদর্শন স্পষ্ট। হালের 'গাথাসপ্তশতী' সাতশত শ্লোকে রচিত প্রাকৃত গীতিকাব্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অশ্বঘোষের 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' গীতিকাব্য গুণান্বিত। গণ্ডী নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসা করে স্রগ্ধরা ছন্দে ২৯টি শ্লোকে কাব্যটি রচিত। পূর্বে বৌদ্ধমঠে গণ্ডী-নামক এক বাদ্যযন্ত্র রাখা হত। তাতে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করলে যে মধুর ধ্বনি নির্গত হত তার মর্মগত আবেদন বৌদ্ধদের কাছে কিরূপ তাৎপর্যপূর্ণ, তারই প্রশংসা করে কাব্যটি রচিত।

খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য সার্থক রূপ লাভ করে কালিদাসের হাতে। মহাকবি সংস্কৃতসাহিত্য জগতকে দুটি গীতিকাব্য উপহার দিয়েছেন—ঋতুসংহার এবং মেঘদূত। প্রথমটি কবির তরুণ বয়সের আর দ্বিতীয়টি পরিণত বয়সের রচনা। তরুণ কবির সৌন্দর্য পিপাসার আগ্রহ প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের আভায় ছয় ঋতুর আবর্তনে 'ঋতুসংহারে' উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কাব্যটি ছয়টি সর্গে বিভক্ত। গ্রীষ্ম থেকে আরম্ভ করে বসন্ত পর্যন্ত ছয়টি ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির পরিবর্তন মানবের মনোজগতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা কবি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

মেঘদূত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। স্বাধিকারপ্রমত্ত কোন এক যক্ষ প্রভু কুবেরের শাপে সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত। কোন এক আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পর্বতের সানুদেশে নবোদিত মেঘকে দেখে বিরহী যক্ষ আকুল আগ্রহে মেঘের কাছে মিনতি জানাল—দূতরূপে সে যেন কুশল সংবাদ বহন করে নিয়ে যায় অলকাপুরীতে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার কাছে। এই কাব্যের দুটি ভাগ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘে আছে মেঘের গমনপথের বিচিত্র বর্ণনা। সে পথে সৌন্দর্য আছে, মাধুর্য আছে, আছে কামার্ত হৃদয়ের কামনার প্রতিফলন। উত্তরমেঘে অলকার সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে যক্ষপ্রিয়ার অনন্যসুলভ রূপসুষমা—"যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।" বিধাতার আদি যুবতি সৃষ্টি যক্ষপত্নীর অসহ্য বিরহব্যথার কাতরতার আবেদনও কম মর্মস্পর্শী নয়। নির্বাসিত যক্ষের বিরহবেদনা ও প্রিয়তমার সঙ্গে মিলনের সুতীব্র বাসনা মন্দাক্রান্তা ছন্দের যাদুতে আবেগচঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই উদ্বেলিত আবেগ রোমান্টিক অভিব্যক্তিতে গীতিকাব্যের তাৎপর্য্য লাভ করেছে। মেঘদূতের মানবিকতার আবেদনও কম তাৎপর্যময় নয়। পরবর্তীকালের দূতকাব্যের উপরও এর প্রভাব সমধিক। কেবল সংস্কৃতসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের আসরেও মেঘদূত বিশেষ সমাদৃত।

তেইশটি শ্লোকে রচিত 'শৃঙ্গারতিলক' কাব্য কালিদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কাব্যটি যে কালিদাসের লেখনী প্রসূত নয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যের রচনারীতি ও উপস্থাপনার ভঙ্গী নিম্নমানের হলেও কিছু কিছু শ্লোকে কাব্যসৌন্দর্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। যেমন—

> **"ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রূরস্যাঃ কার্মুকায়তে।**
> **কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনো মে হরিণায়তে।।"** (শ্লোক-১৪)

Scanned by CamScanner

কিংবা— "ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈশ্চ বিধায় বেধাঃ
কান্তে! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ।।" (শ্লোক-৬)

কবি ঘটকর্পর রচিত 'ঘটকর্পরকাব্য' কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত গীতিকাব্য। ঘটকর্পর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্নরূপে প্রসিদ্ধ। প্রবাসী প্রিয়তমের কাছে বিরহবার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন এক প্রোষিতপতিকা রমণী মেঘকে দূতরূপে নিয়োগ করে। এটাই এই কাব্যের মূল বিষয়। কবি ছিলেন যমক-কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। কাব্যের শেষ শ্লোকে কবি প্রতিজ্ঞা করেছেন—"জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।" অর্থাৎ যমক-কাব্য রচনায় কোন কবি যদি তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন তবে ঘটে করে তিনি তাঁর পা ধোয়ার জল বহন করে আনবেন। কবির এই অহংকার যথার্থ।

অমরু রচিত 'অমরুশতক' কাব্য অবিমিশ্র প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত। প্রেমের পরিপুষ্টির সহায়করূপে পূর্বরাগ, মিলন, অভিমান প্রভৃতি এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী পত্নীর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত শংকরাচার্য রতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হন। পরে তিনি রাজা অমরুর মৃতদেহে নিজ আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে অন্তঃপুরে রাণীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে রতিশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। এই রতিবিষয়ক শতশ্লোকে কাব্যটি রচিত। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ কবির আবির্ভাব কাল।

গীতিকাব্য রচয়িতারূপে কালিদাসের পরেই ভর্তৃহরির স্থান। তাঁর রচিত শতকত্রয়—নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। 'নীতিশতকে' কবি উদ্যম, সাহস, পরোপকার প্রভৃতি গুণের বর্ণনা করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহাত্মক মনোভাব এখানে স্পষ্ট। 'শৃঙ্গারশতক' কাব্যে শৃঙ্গাররসের আনন্দবিহ্বলতার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বেদনার সুর প্রকাশিত হয়েছে। 'বৈরাগ্যশতকে' কবি দেখিয়েছেন যে বিষয়ভোগের অসারতা থেকে নির্বেদ সৃষ্টি হয়। এই নির্বেদই পরিণামে বৈরাগ্যের পবিত্রতায় পর্যবসিত হয়। মন্ময় ভাবনার আবেগে ভর্তৃহরির শতকত্রয় গীতিময় হয়ে উঠেছে। 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরি এবং শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি কিনা এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অনেকে আবার এই ভর্তৃহরিকেই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলে মনে করেন।

হালের 'গাথাসপ্তশতীর' অনুকরণে গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' সাতশত শ্লোকে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। কবি গোবর্ধন ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি এবং জয়দেবের সমসাময়িক। কাজেই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে কাব্যটি রচিত। কাব্যটি আদিরসাশ্রিত হলেও বিশেষ সমাদর লাভ করেনি।

Scanned by CamScanner

বাণের 'চণ্ডীশতক' একশত শ্লোকে রচিত চণ্ডীর স্তুতিমূলক কাব্য হলেও গীতিধর্মী। বাণের এই কাব্যটিতে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর বর্ণনা করা হয়েছে। গৌড়ী রীতির অনুসরণে গাঢ়বন্ধ রচনায় কবি শ্লেষের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাণের সমসাময়িক কালে ময়ূর নামক কবি 'ময়ূরাষ্টক' ও 'সূর্যশতক' রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাণের মত ময়ূরও কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীই এঁদের আবির্ভাব কাল। কিংবদন্তী আছে যে ময়ূর ছিলেন বাণভট্টের শ্বশুর। 'ময়ূরাষ্টক' নামক আটটি শ্লোকে রচিত কাব্যে ময়ূর নিজ কন্যার অর্থাৎ বাণপত্নীর রূপ বর্ণনা করেন। স্বীয় কন্যার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে কবি কন্যার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। পরে সূর্যের স্তবমূলক 'সূর্যশতক' রচনা করে তিনি সেই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হন।

বিল্হণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' পঞ্চাশটি শ্লোকে রচিত অমর প্রেমকাহিনী মূলক গীতিকাব্য। কবি ছিলেন গুজরাটের রাজকন্যার গৃহশিক্ষক। কবি রাজ্যকন্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। ছাত্রীর প্রতি অনুরাগের কথা জানতে পেরে রাজা তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন। বধ্যভূমিতে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রচিত পঞ্চাশটি শ্লোক শুনে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেন এবং রাজ্যকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কাব্যটি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের রচনা। বস্তুতঃ এই কাব্যটি হল প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার স্মৃতির কাব্যময় প্রকাশ V. Varadachari মন্তব্য করেছেন—"The lyric is in the form of the lover's recollections of the pleasures he had in the company of his beloved.[১]" 'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা' নামেও কাব্যটি প্রসিদ্ধ।

দমোদরগুপ্ত রচিত 'কুট্টিনীমতম্' এই জাতীয় কাব্য। কবি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভাকবি ছিলেন। কাশীর পরমাসুন্দরী বারবণিতা মালতী বিকরালা নাম্নী এক কুরূপা রমণীর কাছ থেকে পুরুষের মনকে জয় করার কৌশল শিক্ষা করেছিল। এটাই এই কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজতরঙ্গিণীতে কবির এই কাব্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[২]

দ্বাদশ শতকের বাঙালী কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব দিব্যলীলার ভাবরূপ স্ফুরিত হয়েছে। কথিত আছে যে পত্নী পদ্মাবতীর প্রগাঢ় কান্তাপ্রেমই কবিকে এই কোমলকান্ত পদাবলী রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। আর সেই প্রেরণার ফলেই ভক্তকবি তাঁর মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের দিব্য লীলাভিনয়। 'গীতগোবিন্দ' তারই গীতিময় প্রকাশ। মেঘমেদুর পরিবেশে, তমালদ্রুমে আচ্ছাদিত বনভূমির শ্যামলতায় কবিচিত্তে উৎসারিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের বিজনকেলির জয়গান—

---

১. HSL, P–95

২. "স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টিনীমতকারিণম্"। (রাজতরঙ্গিণী—৪/৪৯৬)

Scanned by CamScanner

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ।। (১ঃ১)

কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। এতে ৮০টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমাবেশ আছে। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে গ্রন্থটি দার্শনিক মহাকাব্যরূপে সমাদৃত। প্রথম সর্গে শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহব্যাকুলতা, দ্বিতীয় সর্গে উভয়ের বিরহব্যাকুলতা ও মিলনোৎকণ্ঠা, তৃতীয় সর্গে শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা, চতুর্থ সর্গে কৃষ্ণের কাছে সখীর মাধ্যমে রাধার অবস্থা নিবেদন, পঞ্চম সর্গে অভিসারিণী শ্রীরাধিকার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা, ষষ্ঠ সর্গে শ্রীকৃষ্ণসমীপে শ্রীরাধিকার প্রেরিত সঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ঠাহীনতা, সপ্তম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধার মনস্তাপ, অষ্টম সর্গে রাধার মান, নবম সর্গে রাধার মানভঞ্জনের চিন্তায় কৃষ্ণের ব্যাকুলতা, দশমসর্গে রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুনয়, একাদশ সর্গে উভয়ের মিলন সম্ভাবনায় উল্লাস এবং দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের মিলনবিলাস বর্ণিত হয়েছে।

জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর পদলালিত্য ও ললিতমাধুরী সত্যই হৃদয়গ্রাহী। গীতগোবিন্দ পাঠে কারা যথার্থ অধিকারী সে সম্পর্কে কবি বলেছেন— যদি কৃষ্ণচিন্তায় মনকে সরস করতে হয়, যদি তাঁর বিলাসকলা জানার কৌতূহল থাকে তবেই জয়দেবের এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী পাঠ বা শ্রবণ করা উচিত—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।।" (১ঃ৩)

প্রথম সর্গের দশাবতার স্তোত্র ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। দশম সর্গের একটি উক্তি তো ভাবের মাধুর্যে এবং অর্থের গভীরতায় অনবদ্য—"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্ (১০.৮)। এই গীতিকাব্যের আধ্যাত্মিক আবেদন ছাড়াও কাব্যশিল্পের আবেদনও কম নয়। জযদেবের রচনায় বাংলা ভাষার মতই সহজ-সরল শব্দসুষমা ও ছন্দের ঝঙ্কার অনায়াসে হৃদয়কে আপ্লুত করে। বহু প্রাচ্য পণ্ডিত গীতগোবিন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক কীথের মতে—"Jayadeva's work is a masterpiece and it surpasses in its completeness of effect any other Indian poem. It has all the perfection of the miniature word pictures which are so common in Sanskrit poetry, with the beauty which arises as Aristotle asserts from magniture and arrangement.[১]" বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্যধারার উৎসও এই গীতগোবিন্দ। সঙ্গীতে, নৃত্যনাট্যে, এমন কি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও গীতগোবিন্দের অবাধ পদসঞ্চার অনায়াসলক্ষ্য। ভাবগাম্ভীর্যে, পদলালিত্যে,

---

১. A. B. Keith : HSL, P–194

Scanned by CamScanner

ছন্দোমাধুর্যে এবং শাশ্বত সৌন্দর্যের চিত্রকল্পে জয়দেব সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ী কবি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়—

"বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।।"

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবি জয়দেবের জন্ম। গীতগোবিন্দের সমাপ্তিশ্লোক[১] থেকে জানা যায় যে কবির পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর এবং জয়দেব এঁরা লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন। কেন্দুবিল্ব বলতে বীরভুমের অজয়নদীর তীরবর্তী 'কেন্দুলি' গ্রামকে আমরা বুঝি। উড়িষ্যার পুরীর সন্নিহিত প্রাচীনদীর কাছেও 'কেন্দুলী' নামে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। আবার মিথিলাতেও 'কেন্দোলি' নামে একটি গ্রাম আছে। কাজেই বাংলা, উড়িষ্যা ও মিথিলা জয়দেবকে নিজের নিজের অঞ্চলের কবিরূপে দাবী করে।

পরবর্তীকালে কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে অনেক দূতকাব্য রচিত হলেও একমাত্র ধোয়ীর 'পবনদূত' ছাড়া অন্য কোন কাব্য সমাদর লাভ করে নি। মানতুঙ্গসূরীর 'ভক্তামরস্তোত্র', শঙ্করাচার্যের 'ভবান্যষ্টক', আনন্দলহরী ও সৌন্দর্যলহরী, রামানুজের 'শতশ্লোকী গীতা', আনন্দবর্ধনের 'দেবীশতক', জগদ্ধরের 'স্তুতিকুসুমাঞ্জলি', মধুসূদন সরস্বতীর 'আনন্দমন্দাকিনী', বজ্রদত্তের 'লোকেশ্বরশতক', পুষ্পদত্তের 'শিবমহিম্নস্তোত্র', লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং বৌদ্ধ ও জৈন কবিদের বিভিন্ন স্তোত্র গীতিকাব্যধর্মী।

---

১. শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।। (১২/২৯)

Scanned by CamScanner

গদ্যকাব্য (Prose Romance)

দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্য দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রব্যকাব্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গদ্যকাব্য অন্যতম। গদ্যরচনাই হল কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। তাই বলা হয়ে থাকে—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" গদ্যকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে দণ্ডী বলেছেন—"অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্[১]।" অর্থাৎ পাদবিহীন ও অর্থসমন্বিত পদসন্নিবেশই গদ্য। বিশ্বনাথও ছন্দোবদ্ধ পাদবিহীন বৃত্তবন্ধকে গদ্য আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন—"বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্[২]।" এই গদ্যকাব্যের আবার বিভিন্ন অবান্তর ভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা, এবং কথালিকা। তাই অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

> **"আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।**
> **কথালিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা।।"**

গদ্যকাব্যের এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কথা ও আখ্যায়িকা। অগ্নিপুরাণে, রুদ্রটের কাব্যালংকারে, ভামহের কাব্যালংকারে, হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে কথা ও আখ্যায়িকার স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে।

ঠিক কবে কোন্ সময় থেকে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের সূচনা—এ বৃত্তান্ত আজও রহস্যাবৃত। পণ্ডিতদের অনলস অধ্যবসায় এ বিষয়ে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। যজুর্বেদসংহিতা থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে গদ্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গদ্যে রচিত। অথর্ববেদেও কিছু কিছু গদ্য রচনা পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ এবং সূত্রসাহিত্য সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনার পরিচয় বহন করে। পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিকসূত্রে কাত্যায়ন আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সাবলীল গদ্যরচনাশৈলী পরিলক্ষিত হয়। মহাভাষ্যকার 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' এবং 'ভৈমরথী' নামে তিনটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু এই গদ্যকাব্যগুলি আজ কালগর্ভে বিলীন বলে এদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'বৃহৎকথা' নামটির সঙ্গে 'কথা' শব্দটি যুক্ত আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' শব্দ দুটি অতি প্রাচীন। ভোজ তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে[৪] বররুচির 'চারুমতী' ছাড়াও 'মনোবতী' ও 'শাতকর্ণীহরণ' নামক দুটি গদ্যরচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সোমিলের 'শূদ্রককথা', শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী', ধনপালের দ্বারা উল্লিখিত 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী'[৫] প্রভৃতি গদ্যকাব্য আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। আলংকারিক ভামহ কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ নির্দেশ করেছেন।[৬] দণ্ডী উভয় গদ্যকাব্যকে

---

১. কাব্যাদর্শ, ১/২৩ ২. সা. দ. ৬/৩০৯ ৩. মহাভাষ্য, ৪/৩/৮৭, ৫/২/৯৫

৪. শৃঙ্গারপ্রকাশ, ২৮/৩ ৫. "সুশ্লিষ্টললিতা যস্য কথা ত্রৈলোক্যসুন্দরী"—(তিলক মঞ্জরী)

৬. কাব্যালংকার ১/২৫—৩০

Scanned by CamScanner

একই শ্রেণীভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন—"তৎ কথাখ্যায়িকাত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা"। বাণভট্ট স্বরচিত হর্ষচরিতে ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যরচনার প্রশংসা করেছেন—"ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে।" এই সকল উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ঊষর মরুতে দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে নি। এই গদ্যকাব্য রচয়িতাদের লেখনীতে যে সুবর্ণযুগ সূচিত হয়েছে তার পূর্বেও নিশ্চয়ই গদ্যকাব্যের একটা প্রস্তুতি পর্ব ছিল। পূর্বসূরীদের সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণ গদ্যকাব্যের সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করেছেন।

দণ্ডী

কাব্যলক্ষণাক্রান্ত সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ইতিহাসে দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণভট্টই অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' একটি বিশিষ্ট গদ্যকাব্য। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভের সামান্য পূর্ববর্তী সময়কে দণ্ডীর আবির্ভাব কাল বলে মনে করা হয়। "ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ"—রাজশেখরের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে দণ্ডী তিনটি গ্রন্থের প্রণেতা। 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্য, এবং 'কাব্যাদর্শ' নামক অলংকার গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা। কেউ কেউ 'ছন্দোবিচিতি'-কে, আবার কেউ কেউ 'অবন্তিসুন্দরী-কথা'-কে দণ্ডীর তৃতীয় রচনা বলে মনে করেন। 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে দণ্ডী বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হলে সরস্বতী ও শ্রুতের দ্বারা পালিত হন। তিনি কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন এবং কাঞ্চীরাজ নরসিংহবর্মার রাজসভায় উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দশকুমারচরিতের রচয়িতা দণ্ডী এবং কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডী একই ব্যক্তি কিনা এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কাব্যাদর্শে দণ্ডী কাব্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দশকুমারচরিতের বহুস্থলে সেই আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন যে, দশকুমারচরিত কবির তরুণ বয়সের রচনা এবং কাব্যাদর্শ পরিণত বয়সের রচনা বলে উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[১]

দণ্ডীর প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য "দশকুমারচরিত" আখ্যায়িকা শ্রেণীর রচনা। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। পূর্বপীঠিকায় আছে পাঁচটি উচ্ছ্বাস এবং উত্তরপীঠিকায় আছে আটটি উচ্ছ্বাস। গ্রন্থটির প্রারম্ভ ও শেষ দুই-ই অসংলগ্ন। সম্ভবতঃ দণ্ডী দশকুমারচরিত গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি, অথবা তাঁর রচনার কিয়দংশ নষ্ট হওয়ায় পরবর্তীকালে সেই অংশ অপরের দ্বারা রচিত হয়েছে। 'দশকুমারচরিত'

---

১. ".......it is perfectly possible and even probable that the romance came from the youth and the Kavyadarsa from his more mature judgement....."—A. B. Keith : HSL, P–296.

Scanned by CamScanner

নামানুসারে এই গদ্যকাব্যে দশজন কুমারের বৃত্তান্ত অপেক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রথম আটটি উচ্ছ্বাসে আটজন কুমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য পরবর্তীকালে পূর্ব পীঠিকা এবং উত্তরপীঠিকা নামক দুটি অংশ মূল গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। মগধের রাজা রাজহংস মালবরাজ মানসারের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পত্নী বসুমতী সহ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে রাজার একটি পুত্র জন্মায়। তার নাম রাজবাহন। আরও নয়জন মন্ত্রিপুত্র ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। কুমারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পর ঋষি বামদেবের পরামর্শে রাজহংস তাঁদের দিগ্‌বিজয় যাত্রার অনুমতি দেন। কুমারেরা দেশভ্রমণে বেরিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে এসে উপস্থিত হন। সেখানে ব্রাহ্মণবেশী কিরাত মাতঙ্গের সঙ্গে রাজবাহনের সাক্ষাত হয়। পাতালকন্যা কালিন্দীর সঙ্গে মাতঙ্গের বিবাহে সাহায্য করার জন্য সকলের অলক্ষ্যে রাজবাহন প্রস্থান করেন। অপরাপর কুমারগণ রাজকুমারের অন্বেষণে বেরিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে তাঁরা আবার একত্রে মিলিত হন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী ব্যক্ত করেন। 'দশকুমারচরিত' এই দশজন কুমারের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচিত্র কাহিনীর রমণীয় আলেখ্যমালা।

দশকুমারচরিত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবনতি কবি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। লোভ, অসাধুতা, প্রতারণা, গুপ্তপ্রণয়, নারীহরণ, চুরি প্রভৃতি সামাজিক কুৎসিত দিকগুলিরও তিনি বাস্তবোচিত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণভাবে দণ্ডীর রচনারীতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। গদ্যকাব্যের রীতি অনুযায়ী স্থানে স্থানে গৌড়ী রীতি এবং সমাসবহুল ওজোগুণের সমাবেশ থাকলেও দণ্ডীর রচনা অযথা পাণ্ডিত্যের ভারে ক্লিষ্ট নয়। তাঁর সরল, ললিত এবং সাবলীল বর্ণনার জন্যই এরূপ প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে—"দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্।" ললিতমধুর পদসন্নিবেশ এবং অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগবাহুল্য বশতঃ কাব্যের গীতিময়তাই পদলালিত্যের মূল। দণ্ডির রচনার চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে এই পদলালিত্য অনায়াসলক্ষ্য। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে ও বাস্তব চিত্র অঙ্কনে দণ্ডী একজন কুশলী কথাশিল্পী। তাই অধ্যাপক কীথ যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"Dandin is unquestionably masterly in his use of language. He is perfectly capable of simple easy narrative, and in the speeches which he gives to his characters he avoids carefully the error of elaboration of language."[১]

সুবন্ধু

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' অপর একটি উল্লেখযোগ্য গদ্যকাব্য। সুবন্ধুর বাসবদত্তার প্রশংসা করে বাণভট্ট বলেছেন—"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া[২]।" এর থেকে বলা যায়—

---

১. A. B. Keith : HSL, P–304

২. হর্ষচরিত।

Scanned by CamScanner

সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী। তবুও সুবন্ধুর আবির্ভাব কাল নিয়ে জটিলতা কমে নি। "ন্যায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাং বুদ্ধসঙ্গতিমিবালংকারভূষিতাম্"—সুবন্ধুর এই রচনাংশ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, সুবন্ধু এখানে উদ্যোতকার এবং ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ধর্মকীর্তি রচিত 'বুদ্ধসঙ্গতি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। বাসবদত্তার সম্পাদক গ্রে তাই সুবন্ধুকে বাণ ও উদ্যোতকারের অন্তর্বর্তীকালের কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন। বাসবদত্তার অপর সম্পাদক R. V. Krishnamachariar-এর মতে সুবন্ধু হলেন বাণের উত্তরসূরী এবং আলংকারিক বামনের পূর্ববর্তী। অনেকে আবার সুবন্ধুকে বাণের পরবর্তী কবিরূপে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাক্‌পতিরাজ তাঁর গৌড়বহ নামক প্রাকৃত ঐতিহাসিক কাব্যে (শ্লোক-৮০০) ভাস, কালিদাস এবং হরিচন্দ্রের সঙ্গে সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বার্ধে এই গ্রন্থটি রচিত। সুতরাং সপ্তম শতকের শেষভাগকে সুবন্ধুর রচনাকালের উত্তরসীমারূপে গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। অধ্যাপক কীথ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়কে সুবন্ধুর আবির্ভাবকাল রূপে উল্লেখ করেছেন—"....... Subandhu must be placed in the second quarter of the seventh century and that he was only a contemporary of Bāna whose work came to fruition before Bāna's.[১]

সুবন্ধুর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বাসবদত্তার প্রারম্ভিক পদ্যবন্ধে কবি নিজেকে 'সুজনৈকবন্ধুঃ' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এর থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, কবির সুজন নামে এক ভাই ছিলেন। আবার অনেকের মতে সুবন্ধু ছিলেন প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির ভাগিনেয়। তবে এসকল মতের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকায় সেগুলি সর্ববাদিসম্মত নয়। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে কবি কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কবির জন্মস্থান বা বাসস্থান সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য দুর্লভ।

সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তা শ্লেষপ্রধান কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু এবং কুসুমপুরাধিপতি শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুন্দরী রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখে কন্দর্পকেতু বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে তার অন্বেষণে বের হন। বাসবদত্তাও এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে সখী তমালিকার কাছে তা ব্যক্ত করেন। বিন্ধ্যপর্বতের এক অরণ্যে শুকশারীর কথোপকথন থেকে কন্দর্পকেতু জানতে পারেন যে, বাসবদত্তার পিতা কোন এক বিদ্যাধর-রাজকুমারের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন। একথা শুনে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে নিয়ে পলায়ন করেন এবং অরণ্যে রাত্রি অতিবাহিত করেন। সকালে বাসবদত্তা ফলমূল সংগ্রহের জন্য যান। তাঁকে লাভ করার জন্য দুই কিরাতসৈন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ

১. A. B. Keith HSL, P–308

২. "সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।"—শ্লোক-১৩।

করে। ঋষির আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ায় ঋষি বাসবদত্তাকে অভিশাপ দেন। বাসবদত্তা পাষাণে পরিণত হন। বাসবদত্তাকে না পেয়ে কন্দর্পকেতু আত্মত্যাগে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে—হারাণো প্রিয়ার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হবে। কন্দর্পকেতু বনপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রেয়সীর অনুরূপ শিলামূর্তি দেখে তা স্পর্শ করা মাত্রই পাষাণী মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। উভয়ের মিলন হয়। সংক্ষেপে এটাই বাসবদত্তার কাহিনী। গ্রন্থের আখ্যানভাগ নগণ্য হলেও কবির রচনার গুণে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রচনার মধ্যে নিহিত আছে কবির বহুশাস্ত্রে পারঙ্গমতার নিদর্শন। কথালাপের ক্ষেত্রেও সরল বাগ্‌ভঙ্গী প্রশংসনীয়। তবে চরিত্রচিত্রণে ও পরিহাস পরিপাটিতে কবির দৈন্য স্পষ্ট। শ্লেষ, বিরোধাভাস অলংকারের বাহুল্য এবং সমাসবদ্ধ পদের সন্নিবেশ অনেক সময় ভাবপ্রতীতির পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

বাণভট্ট

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের জগতে বাণভট্ট কবিসার্বভৌম। আলংকারিকদের মতে গদ্যরচনাই হল কবিলেখনীর নিকষিত হেম—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" বাণভট্ট গদ্যরচনার পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'হর্ষচরিত'-এর প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ তাঁর বিস্তৃত-বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বাৎসায়ন বংশীয় চিত্রভানুর পুত্র বাণ। বাণের পিতামহের নাম অর্থপতি। শৈশবে বাণ মাতৃহারা হন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। কিশোর বাণ পিতৃশোকে আকুল হয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ধুদের সঙ্গে মিশে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন এবং দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভ্রাতা কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় স্থান লাভ করেন এবং অচিরেই বিদ্বৎপ্রিয় রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই (৬০৫-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) বাণের কবিপ্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। বাণভট্ট সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে দুটি গদ্যকাব্য উপহার দিয়েছেন—হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী।

'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য। গ্রন্থের প্রথম আড়াইটি উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তারপর শুরু হয়েছে পুষ্যভূতি বংশের কাহিনী। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু, গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ, মালবরাজের দ্বারা গ্রহবর্মার নিধন, রাজ্যশ্রী অপহরণ, গৌড়েশ্বরের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, হর্ষের যুদ্ধযাত্রা, রাজ্যশ্রী উদ্ধার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যোচিত বর্ণনায় হর্ষচরিত সমৃদ্ধ। এটি ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত হলেও এখানে ইতিহাস গৌণ, কাব্যশিল্পই মুখ্য হয়ে উঠেছে। দিবাকরমিত্রের আশ্রমে সর্বধর্ম সমাবেশ বর্ণনা, বিন্ধ্যগিরির বর্ণনা, সন্ধ্যা ও যুদ্ধের বর্ণনা প্রভৃতিতে কবির ভূয়োদর্শন এবং বিবিধ শাস্ত্রনিষ্ণাততার ছাপ স্পষ্ট। রাজ্যশ্রীর বিবাহ উপলক্ষ্যে উৎসবের আতিশয্য এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যের সাড়ম্বর বর্ণনা কবির ভূয়োদর্শনেরই ফলশ্রুতি। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে প্রিয়জনের শোকবিহ্বলতার বর্ণনা সত্যই মর্মস্পর্শী। কবির বর্ণনায় একদিকে যেমন আছে সমাসবহুল ওজোগুণের সমাবেশ, তেমনি আছে

Scanned by CamScanner

বিষয়ানুগ সরল অনাড়ম্বর বর্ণনার স্নিগ্ধ সরলতা। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, শব্দের গাম্ভীর্যে ও মণ্ডনকলার প্রাচুর্যে কবি তাঁর রচনাকে যথার্থ কাব্যধর্মী করে তুলেছেন। হর্ষচরিত যেন অলংকৃত এক অপরূপ কাব্যহর্ম্য।

'কাদম্বরী' বাণের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। কল্পনার স্বাধীনতায়, বর্ণনার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাদম্বরী'-শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ যেমন মত্ত হয়, কাদম্বরী-কাব্যরস পানেও পাঠক তেমনি আনন্দে বিভোর হন, আহারেও তাঁদের রুচি থাকে না। তাই বলা হয়—"কাদম্বরীরস-জ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।" এই গদ্যকাব্যের পূর্বভাগ বাণের রচনা, উত্তরভাগ রচনা করেন বাণের পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ।

কাদম্বরী হল তিন জন্মে সংক্রমিত অমর প্রেমকাহিনী। কাহিনীর বক্তা শূদ্রকের রাজসভায় চণ্ডালকন্যা মাতঙ্গিনীর দ্বারা আনীত একটি শুকপাখী। এর নায়ক চন্দ্রাপীড় এবং নায়িকা কাদম্বরী। নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনীর পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়বৃত্তান্ত। ব্যাধের হাতে শুকপাখিটির পিতার মৃত্যু হলে জাবালি মুনি তাকে প্রতিপালন করেন এবং তার পূর্বজন্মের কথা শোনান। শুকপাখিটি পূর্বজন্মে ছিল বৈশম্পায়ন এবং রাজা শূদ্রক পূর্বজন্মে ছিলেন চন্দ্রাপীড়। জাবালি-কথিত শুকপাখির পূর্বজন্মের বৃত্তান্তটি হল ঃ—

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়। রাজার মন্ত্রী এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু শুকনাসের পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় বন্ধু বৈশম্পায়ন ও সখী পত্রলেখার সঙ্গে দিগ্বিজয়ে গেলেন। একদিন রাজকুমার একাকী কিন্নর দম্পতির অনুসরণ করে পথ হারিয়ে উপস্থিত হন অচ্ছোদ সরোবরের নির্জন অরণ্যে। সেখানে শিবমন্দিরে তিনি দেখতে পান তাপসী মহাশ্বেতাকে। অকালে মৃত প্রণয়ী পুণ্ডরীকের সঙ্গে মিলনের আশায় দৈববাণীর উপর আস্থা স্থাপন করে তিনি তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। মহাশ্বেতার সখী গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীকে দেখে চন্দ্রাপীড় মুগ্ধ হন। কাদম্বরীর অন্তরেও লাগে অনুরাগের ছোঁয়া। ইত্যবসরে পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পর পত্রলেখা ফিরে এসে চন্দ্রাপীড়ের কাছে নিবেদন করল কাদম্বরীর প্রেমদশার কথা। এখানেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়েছে বাণভট্টের লেখনী। কবিপুত্র ভূষণভট্টের দ্বারা সমাপ্ত অবশিষ্টাংশের সারকথা হল ঃ—বন্ধু বৈশম্পায়নের অন্বেষণে চন্দ্রাপীড় পুনরায় মহাশ্বেতার কাছে উপস্থিত হন। এদিকে মহাশ্বেতাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর অভিশাপে বৈশম্পায়ন শুকপাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। বন্ধুর এই হৃদয়বিদারক পরিণতির কথা শুনে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। চন্দ্রাপীড়ের বিরহে কাদম্বরী প্রাণত্যাগে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে—মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী নিজনিজ প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবেন। জাবালির মুখ থেকে এই কাহিনী শুনে শূদ্রক এবং শুকপাখী উভয়েরই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হল। উভয়েই দেহত্যাগ করলেন। অপরদিকে

চন্দ্রাপীড় সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবিত হয়ে কাদম্বরীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বৈশম্পায়নও পুণ্ডরীকরূপে প্রাণ ফিরে পেয়ে মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হলেন। উজ্জয়িনীতে ফিরে পুণ্ডরীকের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে নিয়ে কখনো হেমকূটে, কখনো বা কাদম্বরীর ঈপ্সিত কোন রমণীয় স্থানে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

কাদম্বরীতে বাণের কবিপ্রতিভা যেন সমগ্রতায় পূর্ণ হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ধর্মদাস বাণের রচনার প্রশংসা করে বলেছেন—

"রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনোহরতি।
তৎ কিং তরুণী ন হি ন হি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য।।"

বর্ণনার কল্পতরু বাণের অসামান্য বর্ণননৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গোবর্দ্ধনাচার্য তাঁকে বাগ্‌দেবীর অবতাররূপে অভিহিত করেছেন—

"জাতা শিখণ্ডিনী প্রাগ্ যথা শিখণ্ডী তথাবগচ্ছামি।
প্রাগল্ভ্যমখিলমাপ্তুং বাণী বাণো বভূবেতি।।"

শ্লেষে, শব্দগুম্ফনে, রসে, অলংকারে ও সদর্থবিষয়ক কথাবর্ণনে বাণ যথার্থই পঞ্চানন ছিলেন। বাণের এই প্রশস্তি কেবল ভাবোচ্ছ্বাস নয়, প্রশস্তিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেরই প্রকাশ। বাণের চিত্তভূমি যেন এক আশ্চর্য রঙিন কল্পলোক। আর কাদম্বরী হল সেই কল্পলোকের এক বর্ণাঢ্য কল্পচিত্র। কবির অন্তরে প্রতিভাসিত জগতের অনাবিল আনন্দধারাকে তিনি তাঁর বর্ণনায় উপস্থাপিত করেছেন অনন্ত বৈচিত্র্যে। কবি ক্লান্তিহীনভাবে একের পর এক বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন, একের পর এক চিত্র এঁকেছেন। এমন কোন উপমা নেই, এমন কোন উপমান নেই, এমন কোন অলংকার নেই যা বাণভট্ট তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেন নি। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁর বর্ণনার বহুস্থলে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজে হর্ষচরিতে বলেছেন—"সম্যক্ পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি।" এমন কোন বিষয় নেই যা বাণের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার রশ্মিতে ধরা পড়ে নি। তাই বাণের সম্পর্কে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—"বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।" কি বিষয় বর্ণনে, কি চরিত্রচিত্রণে কি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে—সর্বত্রই কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনন্যসুলভ চিত্রগ্রহিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

পাঞ্চালী রীতিরসিক বাণের বর্ণনার মাঝে মাঝে সমাসবহুল দীর্ঘ বাক্য ও দুরূহ শব্দের সন্নিবেশ আছে যা পাঠককে ভীতিবিহ্বল করে তোলে। তাই জার্মান সমালোচক weber বাণের রচনাকে দুর্গম ও শ্বাপদসংকুল ভারতীয় অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—"Bana's prose is an Indian wood where all progress is rendered impossible by the undergrowth, until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to recon with malicious wild beasts in the shape of uncommon words that afright him." বাণের রচনার

Scanned by CamScanner

এই প্রতিকূল সমালোচনা বস্তুতঃ সমালোচকের অতিশয়োক্তি। মনে হয় এই বিদগ্ধ বিদেশী সমালোচক স্বচ্ছন্দে প্রবহমান বাণের কাব্যধারার প্রাণস্পন্দনকে সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। গদ্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে বাণের পূর্বসূরীরা যুগরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনাশৈলীকে দরবারী ঘরানার যে চড়া সুরের উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছিলেন, তার থেকে নেমে আসার সাধ্য বাণের ছিল না। কাজেই বর্তমান যুগের মাপকাঠিতে অতীত যুগের সাহিত্যকে বিচার করলে চলবে না। বাণের কাব্যের বিচার করতে হলে সমালোচককেও বাণের সমসাময়িক সহৃদয় পাঠকবর্গের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তবে একথা ঠিক যে, বাণের কাব্যকাননে বিচিত্র পুষ্পের বর্ণাঢ্য সমারোহ থাকলেও সেখানে সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর।

শ্বেতাম্বর জৈন ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' অপর একটি গদ্যকাব্য। ধারাধিপতি বাক্‌পতিরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষদিকে কবি এই কাব্য রচনা করেন। কাব্যের প্রারম্ভিক কয়েকটি শ্লোকে পরমারবংশীয় রাজাদের সঙ্গে বাণ, ভবভূতি, রাজশেখর, রুদ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি কবিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এখানেই ধনপাল 'তরঙ্গবতী' ও 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী' নামে দুটি কথাকাব্যের নামও উল্লেখ করেছেন। 'তিলকমঞ্জরী'র মূল উপজীব্য বিষয় হল তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহিনী। নায়িকা তিলকমঞ্জরীর চরিত্রে বাণের কাদম্বরীর চিত্র স্পষ্ট।

সোড্‌ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা' রাজা মলয়বাহনের সঙ্গে উদয়সুন্দরীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ১০২৬ খ্রীঃ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যটি রচিত। দিগম্বর জৈন ওডয়দেব বাদীবসিংহের 'গদ্যচিন্তামণি' একাদশ লম্বকে বিভক্ত গদ্যকাব্য। সত্যধর ও জীবন্ধরের কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। বামনভট্টবাণের 'বেমভূপালচরিত' এই শ্রেণীর রচনা। এই গদ্যকাব্যে বাণের হর্ষচরিতের অন্ধ অনুকৃতি সহজেই অনুমেয়। দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের প্রতিভার দীপ্তিতে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আলোকিত সরণি পরভাবী স্বল্প-প্রতিভাধর কবিদের হাতে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তবুও এই কাব্যগুলি সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ভাণ্ডারকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

Scanned by CamScanner

ড. দেবকুমার দাস সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের কিছু তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদক ড.দেবকুমার দাস মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে

দিলরুবা খন্দকার

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner